চর্যাপদে লোকজীবন

সত্যবতী গিরি

বাংলা সাহিত্য আর বাঙালি জাতি তার সেই আদি সময় থেকেই বলে মানুষের কথা। সুখ দুঃখ আর দৈনন্দিনতায় প্রবাহিত জীবনের কথা। সেই কারণেই হয়তো রাজসভার মহাসামন্ত চূড়ামণির পুত্র শ্রীধরদাস সংস্কৃত ভাষার কবিতা সংকলন করতে বসে বাদ দিতে পারেন না একটি দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালকের সম্পন্ন মানুষের আহার্যের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকার নির্মম বাস্তবতাকে।

চর্যাপদ এই সময়েরই বলয়ে, যদিও ১০০ বছর আগে এর প্রথম আবিষ্কারের পর এর সময় আর স্বরূপ নিয়ে কম জল ঘোলা হয় নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয় 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে। সুতরাং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর নামকরণেই দাবী করেছেন এগুলি দশম শতাব্দীর আর বাংলা ভাষাতেই লেখা। তবে এই নিয়ে বিস্তর বিতর্কের খবরও আমরা জানি। নানা পণ্ডিতের নানা মত। কিন্তু চর্যাপদে সমকালীন মানুষের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে - এটা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই।

চর্যাগীতির পাঠ নির্ণয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ। যেমন ৪৯ সংখ্যক চর্যার দ্বিতীয় চরণের পাঠে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন— ''অদা বাঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ'', কিন্তু শহীদুল্লাহের পাঠ অন্যরকম ''অবও বাঙ্গাল দেশ লুড়িউ''। সুকুমার সেন আবার একেবারে 'বঙ্গাল' শব্দটাকেই বাদ দিয়ে বলেছেন 'অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ''। ডাঃ নির্মল দাশ সুকুমার সেনের পাঠকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই পাঠের মতভেদের ফলে 'বঙ্গল' জাতি 'দাঙ্গাল' অর্থাৎ দস্যুতে পরিণত করেছেন। তবে অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে দঙ্গালিরা যোগীর উল্লেখ আছে। তবুও চর্যাগীতিতে লোকজীবনের প্রাণস্পন্দন শোনা যায় কবিদের আন্তরিক উপস্থাপনায়। একটা বিশেষ ধর্মীয় দর্শন আর ধর্মাচরণের রীতিনীতিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে মানুষের জীবন। চর্যাকারেরা বৌদ্ধ সহজিয়া। তাই চর্যাপদে আর দোহাবলীতে আছে বেদধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বাংলাদেশে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর অভিজাত হিন্দুরা পশ্চিম দেশ থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়ে যাগযজ্ঞ করাতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই বেদযজ্ঞ সম্পর্কে বিরাগ উচ্চারিত হয়েছে সরহপাদের দোহায়—

বম্হণো হিম জানন্ত হি ভেউ
এবই পরিঅউ এ চউবেউ।।
মট্টি পাণী কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহিঁ বইসী অগ্গি হুণন্তঁ
কজ্জে বিরহিও হুঅবহ হোমেঁ।
অক্খি উহাবিও কুড়ু এ ধুমেঁ।

অনুবাদ - ব্রাহ্মণেরা সত্যকার ভেদ জানে না। এইভাবেই চতুর্বেদ পঠিত হয়। তারা মাটি - জল - কুশ নিয়ে মন্ত্র পড়ে। ঘরে বসে অগ্নিতে আহুতি দেয়। ফলহীন অগ্নিহোমের ফলে শুধু কুটুধুমের দ্বারা চোখ পীড়িত হয়।" যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ লোকমানসের স্বতঃস্ফূর্ত বিরূপতারই অভিব্যক্তি।

অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত আছে। সরহের দোহায় দেখা যায় কবি বলেছেন

অইরি এহিঁ উদ্দুলিঅচ্ছারেঁ
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ।।
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণাহীঁ বইসী ঘন্টা চালী
অক্খি ণিবেশী আসন বান্ধী।
কণ্ণেহিঁ খুসখুসাই জণ ধন্ধী।।

আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, মাথায় তাদের জটাভার, ঘরে বসে দীপ জ্বালে, কোণে বসে ঘন্টা চালে, চোখ বুজে আসন বংধে আর কান খুসখুস করে জনসাধারণকে ধাঁধায় ফেলে।

চর্যাপদে বঙ্গ আর কামরু - এই দুটি নাম পাওয়া যায়। আর নদীর নাম পাওয়া যায় গঙ্গা আর জউনা। পদ্মাকে বলা হয়েছে খাল। এর কারণ গঙ্গা সারা ভারতবর্ষে বড় নদী বলেই পরিচিত, আর যমুনাও তখন ছিল বড় নদী। অন্যদিকে পদ্মা তখন শীর্ণ ছিল। সপ্তম শতাব্দীর পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও পদ্মা নেই। একাদশ শতাব্দীর ইদিলপুর তাম্রশাসনে অবশ্য পদ্মাবতী নদীর কথা বলা হয়েছে।

চর্যাপদের ১৩,১৫ আর ৩৫ সংখ্যক পদে অলংকার ব্যবহারেই কেবলমাত্র সমুদ্রের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু পৃথকভাবে বর্ণনা নেই। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় সমুদ্রের সঙ্গে কবিদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না।

পাহাড়ের যে বর্ণনা আছে তা বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়। উঁচু পর্বতে বসবাসকারিণী শবরীর কথা বলা হয়েছে। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে এদের ছবি আছে।

চর্যাগীতিতে শূন্যপ্রান্তর, নদী, ডোবা আর সরোবরের প্রসঙ্গ তো শুধু চর্যাপদে নয়, গোটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেই নানাভাবে আছে। এ তো বাংলার সাধারণ Topography। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে কৃষ্ণ রাধার আঁচল চেপে ধরেন। চণ্ডীদাসের রাধা তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের যন্ত্রণা বোঝাতে খিড়কীর এঁদো ডোবার কথা টেনে আনেন। এছাড়াও চর্যায় পদ্ম আর পদ্মবনের কথা আছে।

বাংলা তথাকথিত অনার্যপ্রধান দেশ। শবর, পুলিন্দ, ডোম, চণ্ডাল এদের জীবনই আভাসিত হয়েছে চর্যাপদে। কিন্তু চর্যাগীতিতে অবজ্ঞাভরে হলেও আছে ব্রাহ্মণের কথা। ১৮ সংখ্যক চর্যায় আছে কুলীনের কথা।

কইসনি হালো ডোম্বী তোহেরি ভার্ভারআলী।
আস্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী।।

কাহ্নপাদ

চঞ্চলা ডোম্বীর চাতুর্য কিছুই বোঝা যায় না, সে বাইরে কুলীন জনের - ভিতরে কাপালিকের। এখানে কুলীন কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত। যাঁরা পাণ্ডিত্যগর্বী তাঁরাও কুলীন, আর যাঁরা কু অথচ হিন্দু আমলের কোন স্মৃতিশাস্ত্রে, ব্যবহার গ্রন্থে বা লিপিতে কুলীনদের কথা নেই। চর্যাগীতির সময়ে সমাজে বর্ণ-বিন্যাস কি ধরণের ছিল — তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। চর্যাপদের পরে সংকলিত হয়েছে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, তারও পরে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ। এই দুটি পুরাণের সাক্ষ্যে চর্যাগীতিতে যে সমস্ত জাতির কথা বলা হয়েছে তাদের অবস্থান নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়।

জাতি	বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী	ব্রহ্মবৈবর্ত অনুযায়ী
তন্তুবায় (২৫)	উত্তম সংকর	সৎশূদ্র
রাজপুত্র (রাউত ৪১,৪৩)	উত্তম সংকর	অসৎশূদ্র
শৌণ্ডিক (৩)	মধ্যম সংকর	অসৎশূদ্র
যুঙ্গি (যোগী, ৩০)	মধ্যম সংকর	অসৎশূদ্র
চণ্ডাল (১৮,৪৯)	অধমসংকর (অন্ত্যজ)	অন্ত্যজ অস্পৃশ্য
শবর (২৮)	বর্ণব্যবস্থা বহির্ভূত (ম্লেচ্ছ)	অন্ত্যজ অস্পৃশ্য
কাপালী (১০,১১,১৮)	-	অন্ত্যজ অস্পৃশ্য
ডোম (১০, ১৮)	-	

চর্যাগীতিতে আরও কয়েকটি জাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। যেমন গন্ধবণিক, তাম্বলী তাম্বুলের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়। সুবর্ণবণিক সোনা রূপার উল্লেখ থেকে মনে করা যায়। জালিক (নদীতে জালের উল্লেখ থেকে), নট (বুদ্ধ নাটক থেকে। চর্যাপদের কবি সিদ্ধাচার্যদের পূর্বজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে এঁদের মধ্যে রাজা, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী, রাজসভার লেখক (লুইপাদ) যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ব্যাধ, শূদ্র ডোমকন্যাকে বিবাহ করে ডোম্বী প্রভৃতি। প্রসঙ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। ঔপন্যাসিক বলছেন সেযুগে যাঁরা শুধু বাংলাতেই কবিতা লিখতেন, তাঁদের কবি না বলে 'পদকর্তা' (পৃঃ ৩৫৪) বলা হোতো। এঁরা রাজদরবারেও সমাদৃত হতেন। চাটিল পাদ, বীণাপাদ ও সরহপাদের কবিতা পাঠের উল্লেখ আছে। লুইপাদ সাতগাঁয়ের রাজা রূপা বাগ্‌দির গুরু।

চর্যাপদে কৃষিকাজের উল্লেখ নেই। কিন্তু তন্তুবায় আর ব্যাধদের জীবনযাত্রার পরিচয় খুবই স্পষ্ট। তবে শবরদের কথা আর তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা চর্যাপদে খুবই উজ্জ্বল। উঁচু উঁচু পর্বতের শিখরে শবর শবরীর বাস। চুলে ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা পরা এই শবরী জায়গা করে নিয়েছে চিরকালের বাংলা কবিতায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর পাহাড়পুরের ভাস্কর্যেও অনিবার্যভাবে এই শবর শবরীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। গবেষক আমাদের জানান- "One plaque (Pl.v.fig. 1) depicts a Sabara Couple in an attitute of embrace.....A Sabara, accompanied by a Sabari, is illustrated in another plaque. Page 73, (Everyday life in ;ala Empire)

শিকারী বেশে শবর আর সঙ্গে শবরী পাহাড়পুরে এই চিত্রও পাওয়া যায়। শবরদের খাদ্য হিসেবে পাহাড়ে চাষ হওয়া কঙ্গুণী ধানের কথা পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়ী অঞ্চলে জুম চাষের পদ্ধতি অবলম্বন করা হোতো কি? মার্কণ্ডেয় পুরাণে শবরদের দক্ষিণ ভারতের আধিবাসী বলা হয়েছে।

তাঁতীরা কেউ কেউ বেশ সমৃদ্ধ ছিলেন। একটি পদে (২৫) তাঁতী বলছেন আমি তাঁতী, সুতো আমার নিজের। পাঁচ তাঁতে বস্ত্রবয়ণের উল্লেখ আছে। তাঁদের সাহায্যে তৈরি করা হত সুধ কট বা শুদ্ধ বস্ত্র। শুদ্ধ বস্ত্র বলতে সম্ভবত দুকুলকেই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় পদে কানেট শব্দে মহম্মদ শহীদুল্লাহ বুঝিয়েছেন 'কন্যাপট্ট' নামে আর এক ধরনের বস্ত্র। কিন্তু অনেকেই কানেট শব্দটিকে 'কর্ণভূষণ' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

চর্যাগানে কাপাসফুলের (৫০) কথা পাওযা যায়। তাই ধরে নেওয়া যায় এই তুলো থেকেও কাপড় তৈরি হোতো। কৌটিল্য বাংলায় চার রকমের বস্ত্র তৈরির কথা বলেছেন- ক্ষৌম, দুকূল, পদ্রোর্ণ (কৌষেয়) আর কার্পাসিকা। সেগুলো সবই চর্যার সময়ে তৈরি হোতো।

তুলো ধুনে ধুনে আঁশ করার (২৬) বর্ণনা থেকে ধুনুরিদের দক্ষতা বোঝা যায়। চর্যায় পাওয়া যায় ব্যাধ আর কাঠুরের জীবনচিত্র। ব্যাধরা সকালে বনে প্রবেশ করে সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। ঘা, খেতে আসা বা জল খেতে আসা হরিণের খুরের ছাপ দেখে ব্যাধ তার সন্ধান করতেন। হরিণ শিকারের জন্য ব্যাধরা ব্যবহার করতো জাল বা জাল শৃঙ্খল, ধণুক আর বাণ। পাহাড়পুরের একটি ভাস্কর্যে আছে এক বৃদ্ধ শবরের ছবি। তার মুখে দাড়ি, পরনে নামমাত্র পাতা দিয়ে তৈরি আবরণ। কাঠুরের কাঠ কাটার উপকরণ ছিল টাঙ্গি (৫) ও কুঠার (৪৫)। কাঠুরের কাটা গাছের কাঠ দিয়েই নদী পারাপারের সাঁকো তৈরি করে দিতেন পুণ্যকামীরা। (৫)

ডোম - ডোমনিরা তাঁত বিক্রি ছাড়াও চাঙারি (১০) তৈরি করে বিক্রি করতো। ডোমনিদের ব্যবহার করতো ব্রাহ্মণরা। শুণ্ডিনীরা মদ চোলাই করতো। তাদের দুয়ারে বিশেষ চিহ্ন দেখেই লোকে যাতায়াত করতো। মদ চোলাই এর উপকরণ ছিল গাছের চিকণ ছাল, ছোট ঘড়া আর একটি সরু নল। ৯ নং চর্যাপদে মদ্যপানে উন্মত্ততার কথা আছে — কাহ্নু বিলসও আসবমাতা, ১৬ নং পদেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়— মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন স এস উ এখী।
মহারসপানে ত্রিভুবন উপেক্ষা করে উন্মত্ত হল।

চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে বীণাবাদনরত মানুষের কথা আছে। আছে বুদ্ধ নাটক অভিনয়ের কথা। পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে এই বীণাবাদনরত মানুষের মূর্তি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকের পর্যবেক্ষণে "We find representation of musicians in some plaques of Paharpur. One plaque portrays a man (PI. VII. fig. 1) playing on a vina." He wears a short and narrow dhoti." (Everyday life in Pala Empire; Page - 73)

চর্যাপদে সেযুগের সাধারণ মানুষের পরিধেয়র কোনো বিবরণ নেই। পাহাড়পুরের ভাস্কর্য থেকেই তার বিবরণ পাওয়া যায়। "The left end of the dhoti is tucked up behind, and the right end is allowed to hang in graceful pleats in front which are shown in curl."

১৮ আর ২২ সংখ্যক পদ থেকে গণিকাবৃত্তি যে সেযুগে স্বীকৃত পেশা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আগম - বেদ- পাঠ, মন্ত্র - তন্ত্র চর্চা আর ঘন্টীমালা সাধারণ মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করতো। কিন্তু তবুও এর প্রবল শক্তিতেই তাদের অস্তিত্ব প্রচার করতো।

চর্যাপদে ভিক্ষাজীবীদের কথা নেই। [কিন্তু বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে কখনও কখনও ভিখারীর কথা আছে।] কিন্তু হরপ্রসাদশাস্ত্রীর তাঁর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের ভিক্ষা করা দেখিয়েছেন। তাদের ভিক্ষার উদ্দেশ্যও বর্ণনা করেছেন। বিহারী দত্তের বিধবা কন্যা মায়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্যই নানা বয়সের ভিক্ষুণীরা আসে। হরপ্রসাদের বর্ণনায়-

''এক একদিন সেই যুবতী ভিখারিণী আসিয়া মায়াকে কত শত বুঝাইত, সে খঞ্জনি বাজাইত, গান করিত, নাচিত, (বলিত)" গুরু ভিন্ন গতি নাই। বজ্রগুরু ভেদাভেদ ভিখারিণী আবার চর্যাপদ গানও করেছেন—

'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতি আই।।
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা
তিও ধাত্র বিলসই উহ লাকে ণা।।
জাগের বাণচিহ্নরূব ণ জাণী

সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।।”

চর্যাপদের বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয় উল্লেখ করবেন না। চর্যাপদে কিছু বলা হয়েছে আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সমকলালীন লোকজীবনের বৃত্তিকে গড়ে তুলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন —“বেণের মেয়ে একটা গল্প, অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে এও তাই। তবে এতে একালের কথা নাই। সব সেই কালের”। এই উপন্যাসে তিনি মূলত বাণিজ্যের কথা বললেও চর্যায় প্রতিফলিত সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের অল্প কিছু ছবিও তাঁর উপন্যাসে আভাসিতহয়। হরপ্রসাদ মহাযান বজ্রযান আর সহজিয়া দলের রেষারেষির কথা বলেছেন। চর্যার বিভিন্ন পদে অবশ্য তার আভাস আছে। নৌকো, নদী, লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে। নৌকোর উল্লেখ আছে অনেক পদে। নামও বিভিন্ন ধরনের— নাব (১৫), নাবী (৮,১৫), নাবড়ি (৩৮) ও ভেলা (৫১)। নৌকোর বিভিন্ন অংশের নামও পাওয়া যায়। কাচ্ছি (কাছি, ৮) কেডুয়াল (দাঁড়, ৮,১৩,১৪); দুখোল (সেঁউতি, ১৪); পতবাল (হাল - শহীদুল্লাহ, পাল - সুকুমার সেন, ৩৮); পুলিন্দা (মাস্তুল, ১৪) ও সাঙ্গ (লুই, ১৩,১৪)। যাত্রার সময়ে নৌকোর খুঁটি উপড়ে ফেলা হোতো (৮)। গুণ টেনে নিয়ে যাওযা হোতো আর নৌকোর জোড়ের ফাঁকে জল ঢুকলে তা লোকে সেঁচে ফেলত। নৌকো পারাপারের জন্য দিতে হত কড়ি। চোর ডাকাতের ভয়ে মানুষ তটস্থ হয়ে থাকত।

চর্যায় গ্রামের উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে নগর আর টালের কথা। ‘টাল’ শব্দটির অর্থ হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন ‘টলমল’। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণ করে শহীদুল্লাহ বলেছেন এর অর্থ নগর। সুকুমার সেনের মতে টাল শব্দের অর্থ টোলা বা বস্তি অথবা টিলা। ডাঃ নির্মল দাশের মতেও ‘টাল’ এর অর্থ উঁচু জায়গা, অর্থ প্রসারে নগর, জনপদ। তিব্বতীতে Grovi Khyer = নগর। উত্তরবঙ্গে এখনো টাড় (ড়ি) + পাড়া, পল্লী (দ্রঃ বাংলা ভাষার অভিদান — জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)। এক্ষেত্রে ‘উঁচু জায়গা বা ‘টিলা’ কথাটিই গ্রাহ্য। চর্যায় একান্নবর্তী পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিতীয় সংখ্যক পদে যেখানে শাশুড়ী ননদ ও শ্যালিকার কথাও বলা হয়েছে। বাড়ির আসবাবের মধ্যে পাওয়া যায় খাট (২৯) পিঁড়ি (১), ঘড়ী (৩), ঘড়ুলি (৩)। সাধারণ মানুষের খাবার দাবারের মধ্যে ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, লাউ, তেঁতুল, পান, কর্পূরের উল্লেখ আছে। কিন্তু মাছের উল্লেখ নেই।

চর্যার কবিদের লক্ষ্য ছিল প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জনগণ (Target Group)। তার পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই মোটামুটি পেয়েছি। এখানে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রসঙ্গে যে আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি জীবনের এখনও মিল আছে। অর্থাৎ ঐ যুগের আচার এখনও জীবন্ত। সন্তান প্রসবের জন্য পৃথক আঁতুড়ঘরের ব্যবস্থা সেকালেও ছিল। উপযুক্ত আঁতুড়ঘরের অভাবে নবজাতকের প্রাণ বিপন্নও হয়ে উঠত —

‘চারি বাসেঁ গড়িলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী,
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কত্রলা কান্দই সগুণশিআলী।।
মরিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে সবরো নিরেবণ ভঈলা ফিটিলি যবরালী।।’

চার বাঁশের চাঁচারি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল। শকুন শিয়াল কাঁদতে লাগল। ভবমত্তকে মারা হল। দশ দিকে পিণ্ড দেওয়া হল। শবর নিশ্চিহ্ন হল। তার শবরালিও ঘুচল। এখনও বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃতদেহ সৎকারে এটিই রীতি। বিবাহ পদ্ধতিতেও মিল দেখা যায়। কাহ্নপাদের ১৯ সংখ্যক চর্যায় সেখালের বিবাহ যাত্রার সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা।।
জঅ জঅ দুন্দুহিসাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিহাহে চলিআ।।
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।।
অহণিসি সুরঅপসঙ্গে জাঅ।
জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ।।

এই ধরনের আড়ম্বরবহুল বিবাহ ছাড়াও সেকালে ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেমীর সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঙ্গা বা বিধবাবিহারে প্রচলন ছিল। কাহ্নের দুটি চর্চায় — ‘আলো ডোম্বী তোএ সম কবির ম সাঙ্গ (১০), চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে (১৩) — তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।” (চর্যাগীতি পরিক্রমা, ১০০ পৃষ্ঠা)

চর্যায় আছে দাবাখেলার প্রসঙ্গ। যে দাবা এখনও জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অলংকারের মধ্যে নানা ধরনের মালার উল্লেখ পাওয়া যায়। হাড়ের, গুঞ্জাফুলের, মুক্তার। এ ছাড়াও আছে কঙ্কণ, কর্ণকুণ্ডল আর কুণ্ডল আভরণ। হাড় আর গুঞ্জা ছাড়া আর সবই নগরবাসী, বাসিনীর অলংকার। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে বলা হয়েছে গ্রাম্য ব্রাহ্মণ মেয়েরা মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মরকত প্রভৃতি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কার্পাস - বীজ, সাকপত্র, অলাবু পুষ্প, দাড়িম্ববীচি, কুষ্মাণ্ড পুষ্পই ছিল তাঁদের পরিচিত।

তাই বলা যায় চর্যাপদে অন্তেবাসী মানুষের কথা আছে। কিন্তু গ্রামীণজীবনের কথা নেই। চর্যার কবিদের রাজ, রাজসভা, নাগরিক জীবনের সঙ্গে যোগ ছিল। হরপ্রসাদশাস্ত্রী তাঁর বেণের মেয়ে উপন্যাসেও এই সংযোগের কথা বলেছেন। এঁরা নাগরিক জীবনেও অভ্যস্ত ছিলেন। তাই নগরের বৈশিষ্ট্যই তাঁদের পতে আছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অরণ্যসংকুল পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবিাসীদের জীবনই চর্যায় প্রাধান্য পেয়েছে। দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনে ভাত না থাকার কষ্ট, দারিদ্রের জন্যই স্বামী পরিত্যক্ত, সদ্য প্রসূতির মৃত সন্তানের জন্য বেদনার হাহাকারই যেন শেষ পর্যন্ত চর্যাবাহিত লোকজীবনের পরিসরকে আচ্ছন্ন করে থাকে।

প্রাবন্ধিক যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা